'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

-প্রসূন ঘোষ

রবীন্দ্র প্রত্যয়ে শিক্ষার মূল আদর্শ হল,সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করা ও বাইরে তার প্রকাশ ঘটানো।তাই সমস্ত রকমের গণ্ডিবদ্ধতা তাঁর কাছে ছিল সেই পরম সত্য উপলব্ধির পথে দুরপনেয় বাধাবিশেষ।কারণ,নিজেকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বেঁধে,জাতিপ্রেম (demon)-এর অহমিকা থেকে সত্যের অন্বেষণ করলে তাকে কখনোই পাওয়া যায় না।আত্মশক্তিতে ভর করে, যাবতীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারলে তবেই সত্যের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যেতে পারে।শিক্ষা হল সেই পথ বা মাধ্যম, যা ক্রমাগত আমাদের সেই অভীষ্টের দিকে নিয়ে চলে।*শিক্ষা (১৯০৮)* গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের মূল্যবান সব অভিমত।আশ্বিন ১৩২৮ বঙ্গাব্দে রচিত *শিক্ষার মিলন* প্রবন্ধ এইরকম এক দৃষ্টান্ত।

শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য সভ্যতার থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার এগিয়ে যাবার কারণগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন। একথা ঠিক যে প্রাচ্য তথা ভারতবর্ষ চিরকালই বাহ্যিক জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা নিহিত সত্যকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।অর্থাৎ সেই শিক্ষা মূলত আত্মিক সাধনার জন্য শিক্ষা। ভারতের সাধনক্ষেত্র সত্যলাভের সাধন ক্ষেত্র।

কিন্তু কালের নিয়মে সাধনার এই পথ অবলম্বনে দেখা গেছে অনীহা।কেননা ক্রমশই বিকার ভারতবাসীকে আচ্ছন্ন করেছে।পাশ্চাত্যের মতো বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে সে নারাজ।অধিক বিষয়ে চিত্তের কুসংস্কারের পথেই তার পদচারণা।জ্ঞানার্জন অপেক্ষা লোকাচারের প্রতি প্রাচ্যদেশ অধিক আস্থাশীল।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা অমৃতের অধিকার লাভ করার আশায় ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্য সভ্যতার অংশীদার মানুষেরা সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছে।বিজ্ঞানের আলোচনায় ভারতবাসী নিজের মনকে ভয়মুক্ত করতে পারেনি।কিন্তু ক্রমান্বয়ে সকল বিষয়ে ভারতবাসী দৈবকে মেনেছে,স্বকীয় বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেনি।এমনকি নির্বিচারে স্বীকার করে নিয়েছে পশ্চিমী সভ্যতার দাসত্ব।উপরন্তু প্রাচ্য দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু - মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ,বর্ণাশ্রম প্রথা,পাশ্চাত্যের বস্তু বিদ্যাকে গ্রহণ করার পক্ষে হয়ে উঠেছিল অন্তরায়।ওখানকার বস্তুবিদ্যা ছিল তাই এদেশের মানুষের কাছে অস্পৃশ্য।ভারতবর্ষ ত্যাগের সাধনা করেছিল ঠিকই,কিন্তু ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই যে প্রকৃত শিক্ষা,তা আয়ত্ত করতে পারেনি।ফলশ্রুতিতে আচারের দ্বারা ভারতবর্ষ সকল মানুষকে একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছিল,সেই ঐক্য সর্বৈবভাবে সফল হয়নি।কেননা তা একদিকে যেমন সমাজকে নির্জীব করে তুলেছিল,তেমনি হয়ে উঠেছিল দৈন্যপীড়িত।অথচ সুখ-দুঃখ, আধি-ব্যাধি, দারিদ্র্য-মহামারী প্রভৃতির করালগ্রাস থেকে পার্থিব সত্তাকে বাঁচাতে হলে অধ্যাত্মবিদ্যায় কোনো সুফল হয় না,তার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের অনুশীলন,ভারতীয় তথা প্রাচ্য সভ্যতা এই বাস্তব সত্যকে জানতে চায়নি।আত্মশক্তিতে ভরসা না করে আচারধর্মী এই সভ্যতা কেবল বাইরের কোনো এক কর্তার উপর নির্বিবাদে নিজের জীবন- মরণ সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল।তাই তাদের অন্য কিছুর অভাব থাকলেও কোনোদিন কর্তার অভাব হয়নি।

অন্যদিকে পশ্চিমী সভ্যতা বিশ্বের নিয়মকে বুদ্ধি বলে নিজের করতলে আনতে পেরেছিল।বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল মূলমন্ত্ররূপে।এই বিজ্ঞান বুদ্ধি ও বাস্তব বিদ্যার জোরে পাশ্চাত্য জড়বিশ্বে নিজের নিয়ম খাটাতে পেরেছে,প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে আপন স্বরাজ।উপরন্তু জড়ের গোলামি থেকে,মায়ার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।এটি সম্ভব হয়েছে যৌক্তিক বিজ্ঞানবোধকে সকলের উপরে স্থান দেবার দরুনই।তাছাড়া

রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের সংস্কারমুক্ত মানসিকতা পশ্চিম সভ্যতার বিশ্বজয় যজ্ঞেকে বহুলাংশে ত্বরান্বিত করেছিল।তারা জেনেছিল যে, সেই নিয়মই সত্য, যে নিয়ম ব্যক্তি বিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না,বিচলিত হয় না কোনো খেয়ালের দ্বারা। এই বিশ্বনিয়মের সঙ্গে বিজ্ঞানের নিয়মের সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য হয়ে উঠেছে বিশ্বজিৎ।শুধু তাই নয়,আদিভৌতিক কিংবা আধিদৈবিক কোনো ব্যাপারকে সংস্কারের বশবর্তী হয়ে পাশ্চাত্য দৈবশক্তি তথা নিজের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করেনি।বিজ্ঞানের নিরাসক্ত মন নিয়ে প্রতিটি কর্মকাণ্ডের খুঁজেছে উত্তর।

কিন্তু এটাই পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ কথা নয়,এই সভ্যতা যে বিদ্যার বলে বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে সক্ষম হয়েছে,তা হল বস্তু বিদ্যা অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষা তথা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। রবীন্দ্র প্রত্যয়ে এই বস্তু বিদ্যা সত্য;কেননা বাহ্য বিশ্বে তা মায়ামুক্তি বা নিরাসক্তির সাধনা করে। কিন্তু পাশাপাশি এই বস্তু বিদ্যা তখনই অসত্য হয়ে ওঠে,যখন বিদ্যাকে প্রভুত্ব ফলানোর কাজেই ব্যবহার করা হয়। তখন তাতে আর আনন্দ থাকে না।পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতির নিয়মকে বশ মানিয়েছে ঠিকই,পাশাপাশি আপন ক্ষমতার বলদর্পে সংযম হারিয়ে সেই বিজ্ঞানকেই মারণ যজ্ঞে প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।সত্যকে- সুন্দরকে কলঙ্কিত করে ধ্বংস করেছে বিশ্বশান্তির বাতাবরণ।ধন লাভের অপরিমেয় আসক্তি,সম্পদ সঞ্চয়ের মারাত্মক ক্ষুধা তাই ক্রমশ সেখানে লোভ নামক মারণ রিপুকে জাগ্রত করেছে।তাদের শান্তি হয়েছে বিনষ্ট।

সুতরাং পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ নয়, প্রাচ্য সভ্যতার পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজন পশ্চিম থেকে জীবন যুদ্ধের হাতিয়ার সংগ্রহ করা;কিন্তু বিশ্বাস রাখা নিজের আত্মশক্তির উপর।পশ্চিম মহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়া মুক্তির সাধনা করেছে,সে সাধনা যাবতীয় বৈষয়িক ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করার সাধনা।অপরদিকে পূর্ব মহাদেশ আপন মনোবিশ্বে অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে,সে সাধনা অমৃতের অধিকার লাভের সাধনা। তাই পরিপূর্ণ জীবনবোধের জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের এই বিচ্ছিন্ন সাধনার সমন্বয় ঘটা দরকার। মিলন ঘটানো দরকার বস্তুবাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার,ভোগের সঙ্গে ত্যাগের, সংসারের সঙ্গে বৈরাগ্যের।এই স্বতোবিরোধী শিক্ষার মিলনের মধ্য দিয়েই অন্তিমে এক সমন্বয়ী আদর্শ গড়ে তোলার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শিক্ষার মিলন প্রবন্ধের প্রারম্ভে এক পিতার দুই সন্তানের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দ্যোতিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।বড়ো ছেলে প্রাচ্য,ছোটো ছেলে পাশ্চাত্য আর মোটর গাড়ি যন্ত্র সভ্যতা তথা বিজ্ঞানের জগৎ -কে চিহ্নিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন,বিজ্ঞানচেতনা সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ, কিন্তু তার বিকার বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।পাশ্চাত্যবিশ্ব এই ধ্বংসাত্মক পথের দিকেই এগিয়ে চলেছে।ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে তাই আবার তাকে ফিরতে ফিরে আসতে হবে প্রাচ্য বিশ্বের কাছে, অর্জন করতে হবে প্রাচ্যের ঐতিহ্যঋদ্ধ শিক্ষা,যা আত্মিক সত্যকে অর্জন করতে শেখায়।

রক্তকরবী-তে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের বিকারের রূপ-কে দেখিয়েছেন।ধনতন্ত্রের আগ্রাসনের ও স্পর্ধার কদর্য রূপটি তিনি আমেরিকায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন।একদা *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থের ৬৪,৬৫ ও ৬৬ সংখ্যক কবিতায় এবং *বলাকা কাব্যগ্রন্থের* ৩৭ সংখ্যক কবিতায় তিনি জাতিপ্রেমের ভয়ানক দিকটিকে দেখিয়েছেন,অন্যদিকে ফ্যাসিবাদের আধিপত্য তথা লেহন ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন *সভ্যতার সংকট* প্রবন্ধ। সভ্যতার সংকট মুহূর্তে মানুষের প্রতি বিশ্বাস যখন চলে যেতে বসেছে,তখন রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচ্য শিক্ষা তথা মানবিকতার সদর্থক বোধে আস্থা প্রকাশ করেছেন।প্রবন্ধের শেষে তিনি প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি চরমতম আস্থা প্রকাশ করেছেন মহামানবের আগমন প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ হিরোশিমা-নাগাসাকির মানবঘাতী

বিস্ফোরণ দেখেননি, ভারতভাগও প্রত্যক্ষ করেননি, কিন্তু দুই সভ্যতার বিকারের রূপটিকে আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন আর তাই দুই সভ্যতার ইতিবাচক শিক্ষার মিলনের প্রত্যাশা করেছিলেন।